আমারবই.কম
দুনিয়ার পাঠক এক হও
www.amarboi.com

এখানে ওজন মাপা হয়

সুমন্ত আসলাম

সুরেশ চণ্ডালের যে একটা ওজন মাপার মেশিন আছে, সেটা কি আপনারা জানেন? সম্ভবত জানেন না। জানে না সেটা অনেকেই। এই না জানাটা তেমন দোষের কিছু না। অর্থমন্ত্রী প্রকাশ করবেন না বলে শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারির আসল হোতাদের নাম যেমন আমরা অনেকেই জানি না, কিংবা মন্ত্রী-এমপিরা তাদের সম্পদের হিসাব দিলেও তাদের কী পরিমাণ সম্পদ আছে সেটা যেমন আমরা জানতে পারি না, তেমনি সুরেশ চণ্ডালের ওই ক্ষুদ্র ব্যাপারটাও আমরা অনেকেই জানি না। তবে মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামে যারা সকালে হাঁটতে আসেন, শরীরের সুগার কমাতে আসেন, চরের মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ভুঁড়ি কমাতে আসেন, তাদের অনেকেই জানেন। হাঁটতে হাঁটতে তারা খেয়াল করেন-ছোটখাটো একটা মানুষ ওজন মাপার একটা মেশিন নিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন। সামনে দিয়ে যে-ই হেঁটে যান ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন, কখনও কখনও এক টুকরো কাপড় দিয়ে পরম মমতায় মুছতে থাকেন মেশিনটি। প্রতিদিন।

মানুষের ওজন মাপেন সুরেশ চণ্ডাল। রাস্তার ধারে বসে দুই টাকার বিনিময়ে সবার ওজন মাপলেও তার নিজের ওজন মাপেন না তিনি কখনও। অথচ তেমন জরুরি না হলেও ওজনটা মাপা দরকার। তার স্ত্রী অপলা চণ্ডাল প্রায়ই বলেন, 'খালি তো অন্যের ওজন মাইপ্যা বেড়ান, নিজের শরীলের দিকে তাকায়াছেন একবার! শুকায়া তো গোবরের ঘুঁটির মতো হয়া গ্যাছেন!' কথাগুলো শুনে হাসেন সুরেশ, কিন্তু কোনো উত্তর দেন না। কেবল তার চেয়েও শুকিয়ে যাওয়া স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, গাছের শুকনো ডালের মতো হাত দুটোতে ঘোলা হয়ে যাওয়া সাদাটে শাঁখা দেখেন, কপালে লেপটে থাকা লাল টকটকে সিঁদুর দেখেন।

সুরেশ চণ্ডালের বাড়ি সিরাজগঞ্জে। ছিল। আওয়ামীবিরোধীরা যেটাকে যমুনা ব্রিজ বলেন আর আওয়ামী লীগাররা যেটাকে বলেন বঙ্গবন্ধু ব্রিজ, সেই ব্রিজটার পশ্চিম পাশে। মাঝখানে; যেখানে এখন রাস্তা হয়েছে, ব্রিজ কর্তৃপক্ষের টাক মাথার মতো মসৃণ পিচঢালা রাস্তা। ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে যে রাস্তাকে দূর থেকে টলটলে পানির মতো মনে হয়, যেখান থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। ফোর হুইলারে চড়ে সেই ধোঁয়া পেরিয়ে যারা নিত্যদিন আসা-যাওয়া করেন, তাদের অনেকেই জানেন না এই রাস্তার নিচে কত স্বপ্ন চাপা পড়ে আছে, কত ফসলের বীজ অ-অঙ্কুরিত অবস্থায় পচে গেছে, কত দূর্বাঘাস নীলচে ফুল ফোটানোর জায়গা হারিয়েছে। দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে আছে রাস্তার প্রতিটি পাথরে, শক্ত হয়ে যাওয়া পিচের গায়ে।

ওই জায়গাটা অবশ্য সুরেশ চণ্ডালের নিজের ছিল না, তার এক পিসতুতো ভাইয়ের, থাকতে দিয়েছিল তাকে। ব্রিজের জন্য জমি অধিগ্রহণ করার সময় পিসতুতো ভাই ব্রিজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে চলে যায় অন্য জায়গায় আর সুরেশ চলে আসেন মুচিপাড়ায়। সিরাজগঞ্জ শহরের পশ্চিম পাশে জুবিলী বাগান এলাকায় একটা মুচিপাড়া ছিল। ছয়-সাতটা পরিবার থাকত। হরিয়া মুচি নামে তার একটা বন্ধু থাকত সেই পাড়ায়। ঠাঁই দিয়েছিল তাকে সেখানে।

www.amarboi.com
info@amarboi.com
Donate us from Paypal at
donate@amarboi.com

আমারবই.কম
দুনিয়ার পাঠক এক হও
www.amarboi.com
সিরাজগঞ্জ শহরে অনেকগুলো চৌধুরী পরিবার আছে। তাদের একজন আফাজ চৌধুরী। আড়াইতলা একটা বিল্ডিং ছিল তার সেই মুচিপাড়ার পাশে। ব্রিটিশ আমলের সেই বিল্ডিংটাতে কেউ থাকত না। ভাঙাও হতো না সেটা। অথচ আশপাশের অনেক আধা-পাকা বাড়ি কংক্রিটের ছয়তলা হয়ে গেছে অনেকদিন; অলৌকিক কারণে কেবল সেটা হতো না। কিন্তু মুচিপাড়ার জায়গাটা একটু একটু করে ছোট হতে থাকে আর আফাজ চৌধুরীর জায়গাটা বড় হতে থাকে এবং একসময় মুচিপাড়াটা বিলীন হয়ে যায়, সঙ্গে সেই আড়াইতলা বিল্ডিংটাও। এরপর ঈদের চাঁদের মতো সবাই একদিন উৎসুক হয়ে দেখে, সমস্ত এলাকাটা নাগরিক হয়ে উঠছে- কোদালের কোপে বিদীর্ণ হচ্ছে মাটির বুক, মাটি পোড়ানো লালচে ইটের মস্ত মস্ত স্তূপ, লোহার রডের হঠাৎ হঠাৎ ঝনঝনানিতে চমকে উঠছে চারপাশ। সিমেন্টের সারি সারি ধূসর বস্তা আর তা থেকে নির্গত গুঁড়োতে ভারী হচ্ছে বাতাস, রূপালি বালিতে চিকচিক করছে ভেজা ভেজা জমিন।
খুট খুট শব্দ শুনতে শুনতে স্থানীয় বাসিন্দারা মাথা উঁচু করে তাকান একদিন। একতলা, দোতলা, পেরিয়ে তিনতলা। আরও কিছুদিন পর চারতলা, পাঁচতলা, ছয়তলা। আলোর ঝলকানিতে ভরে যায় আরও কিছুদিন পর। বিপণনের নতুন পসরা সাজিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে বিপণনকারীরা, সেই সব বিপণন করার জন্য প্রতিদিন ভিড় জমতে থাকে সেখানে। ক্রমে ক্রমে অনেক ভিড় হয়। হাজার হাজার মানুষের পায়ের উড়ন্ত ধুলোর মতো সুরেশ □□লও উড়ে যান একদিন। বানিয়ারচর পেরিয়ে টঙ্গীর ফুটপাত, সেখান থেকে মিরপুরের গুদারাঘাট হয়ে সুরেশ □□ল এখন রূপনগরের ঝিল বস্তির বাসিন্দা। সরকারি ঝিলের ওপর বাঁশের মাচা বানিয়ে ঘর তোলা মস্তাজ মুন্সীর সাত ফুট বাই আট ফুট ঘরে তার নিত্য আবাস।
সুরেশ □□ল শুনেছিলেন-ঢাকায় নাকি টাকা ওড়ে, আকাশ-বাতাসে উড়ে বেড়ায়। সিরাজগঞ্জ টু টঙ্গী বাসস্ট্যান্ডে নেমে তাই প্রথম তিনি তাকিয়ে ছিলেন আকাশের দিকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। ধোঁয়ার মতো চারপাশ, আকাশ ভেদ করা দালান ছাড়া তেমন কিছুই চোখেই পড়েনি তার। আর গিজগিজ করা মানুষ। এত মানুষ খাবার পায় কোথায়-কয়েকটা দিন শুধু এ কথাটাই ঘুরছিল তার মাথায়।
টঙ্গীর ঢালে বসে অপলা □□ল কিছুটা খেদ নিয়ে বললেন, 'আপনে আমারে এ কোনহানে নিয়া আইলেন?' সুরেশ চ ল জবাব দেন না। হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে কাপড়ের পুঁটলিটা নিয়ে খুলতে থাকেন। খুলতে খুলতে আপন মনে শুকনো চিঁড়ে বের করে মুখে দিতে থাকেন, অবাক চোখে মানুষ দেখেন, কত্তো মানুষ!
টঙ্গীর সরকারি স্কুলের বারান্দাটা বেশ বড়। ঘুরতে ঘুরতে সেই বারান্দায় বসে এই প্রথম দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন সুরেশ। কিছু একটা তো করতে হবে। কী করবেন তিনি? কে তাকে কাজ দেবে? বাপ-দাদা মরা পোড়াতেন। প্রথম প্রথম তিনিও তো পোড়াতেন। যমুনা নদীর পাশে ঘুরকার শ্মশানে শেষ মরা পোড়ানোর কথা তার এখনও মনে আছে। নিত্যানন্দ ভৌমিকের লাশ ছিল সেটা। বড় ভালো মানুষ ছিলেন। বিপত্নীক মানুষ, নিজের সব অর্থ-সম্পত্তি দিয়ে অন্যের উপকার করে বেড়াতেন। কোনো ধর্ম মানতেন না। তার কাছে মসজিদ-মন্দির একই, স্রষ্টাকে ডাকার নিভৃত স্থান। তার কাছে মানুষের সেবা মানেই ঈশ্বরের সেবা। আর সেই মানুষটাকেই কিনা বুকে ছুরি বসিয়ে মেরে ফেলল! সমস্ত সম্পত্তি দান করতে চেয়েছিলেন একটা প্রার্থনা কেন্দ্র বানানোর জন্য, যেখানে বসে সবাই স্রষ্টাকে ডাকবে, মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করবে। নিকটাত্মীয়দের কেউ সেটা মেনে নিতে না পেরে, সবকিছু নিজের করে পাওয়ার জন্য, সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়ার আগেই তাই এই মৃত্যু পর্ব, মানবিকতার চরম স্খলন, মনুষ্যত্বের নির্লজ্জ পতন! সারা শরীরের ওপর শুকনো কাঠ রেখে, তাতে সামান্য ঘি ঢেলে, মুখাগ্নি করার কিছুক্ষণ পর ঘৃতাহুতি ছেড়ে নিত্য বাবু হঠাৎ উঠে বসেন। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, শরীরের গিঁট ভাঙার পট পট শব্দ হচ্ছে, তবুও তিনি বসে আছেন, স্থির হয়ে, দৃঢ় মেরুদ□□ে! সবার চোখে এক ধরনের আতঙ্ক ভর করে, মোটা একটা বাঁশ এনে তারা নিত্য বাবুকে ঠেসে ধরেন দ্রুত, চেপে রাখেন অনেকক্ষণ আগুনের ভেতর। সুরেশ □□ল এসবের কিছুই বুঝতে পারেন না, কেবল ভাবতে থাকেন-লাশ

www.amarboi.com
info@amarboi.com
Donate us from Paypal at
donate@amarboi.com

কীভাবে উঠে বসে? কীভাবে আগুন ঠেলে চেতনাহীন একটা শরীর জেগে ওঠে? তবে কি নিত্য বাবু তার পুণ্যের জোরে জেগে উঠেছিলেন? শেষবারের মতো মায়ার দুনিয়াটাকে দেখতে চেয়েছিলেন? কিংবা মানুষের সব নীচতাকে প্রশমিত করার জন্য কিছু বলতে চেয়েছিলেন-হে মানুষ, তুমি যত বড়ই হও, যত প্রতিপত্তিই তোমার থাকুক না কেন, সব ক্ষমতা, সব অহঙ্কার বিলীন করে তোমাকে একদিন এভাবে আসতে হবে!

সুরেশ চাঁড়াল এরপর আর কখনও মরা পোড়াতে যাননি।

টঙ্গীর আশপাশে অনেক সবজি চাষ হয়। অনেকেই সেগুলো কিনে এনে মূল রাস্তার পাশে বসেন। বিক্রি করে ভালোই লাভ হয়, সুরেশেরও হতো। ভালোই কেটে যাচ্ছিল দিন-সারাদিন সবজি বিক্রি আর এর ওর কাজ করে দেওয়া। রাতে সরকারি স্কুলের খোলা বারান্দায় খোলা বাতাসে ঘুম, পরিশ্রমী ঘুম। এক রাতে এভাবে ঘুমিয়ে ছিলেন তারা। সারাদিনের ক্লান্তি আর অবসাদের ঘুম। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ। নেশার সব গন্ধই সুরেশের চেনা, তিনি নিজেও তো কম নেশা করেননি। মরা পোড়ানোর আগে তো বটেই, সন্ধ্যার পর থেকে রাত পর্যন্তও। অনেকে মিলে, আনন্দে, হতাশায়, অভ্যাসে। তার নাক পায় নেশার গন্ধ, একটু পর তার চোখ দেখতে পায় তিনজন সোমত্ত পুরুষকে। ঢুলতে ঢুলতে তারা বউয়ের পাশে এসে থামে। পাশে রাখা সবজির ঝাঁকা বয়ে আনার বাঁশের লাঠিটা হাতে নেন সুরেশ। আধো আলো আধো অন্ধকারে তাদের নেশাগ্রস্ত চোখ সুরেশের চোখ দুটোকে দেখে-সেখানে হঠাৎ সরলতার মাঝে ভ্রুকুঞ্চন, কেঁপে কেঁপে ওঠা চোখের পাপড়িগুলো হঠাৎ স্থির, চোখের সাদা অংশটা কেমন যেন রক্তাভ। লাঠি চেপে ধরা নির্মেদ হাতের রক্তনালিগুলো কেমন ফুলে উঠেছে, শরীরটাও টনটনে, যেন আক্রমণের তুমুল প্রস্তুতি। নেশার জায়গায় আতঙ্ক এসে ছায়া ফেলে তাদের মনে। ঢুলতে ঢুলতে যেমন এসেছিল তেমনি চলে যায় তারা। বাকি রাত আর ঘুম হয় না সুরেশের। খাবারের সন্ধান পেলে শেয়াল যেমন বারবার আসে, নষ্ট পুরুষরাও তেমনি লোভ-লালসায় হানা দেয় বারবার। পরদিন সকালেই উঠেই দুটো পাতিল, দুটো থালা, একটা গল্গাস আর একটা চামচের সংসার নিয়ে তারা চলে আসেন মিরপুরের গুদারাঘাটে। সবজি বিক্রি সূত্রে একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, গুদারাঘাটের একটা বস্তির খুপরিতে ওঠার ব্যবস্থা করে সে। তারপর ব্যবসা আগেরটাই। মিরপুর বাঁধের পাশে বিরুলিয়া গ্রাম, সবুজ সবজিতে ভরে থাকে সেটা সব ঋতুতেই। কিনে এনে বিক্রি করলে বেশ লাভ। আবার সবজি বিক্রেতা হয়ে ওঠেন সুরেশ।

সিরাজগঞ্জের আফাজ চৌধুরী ছড়িয়ে আছে সারাদেশে, ভিন্ন নামে-কারও নাম কামাল তরফদার, কারও নাম ইলিয়াস মুন্সী, কেউ আবার ইসলামুল হক। সুরেশের খুপরি ঘরের বস্তির জায়গাটা হঠাৎ একদিন হয়ে যায় এক ক্ষমতাবানের। আধা পাকা অনেক ঘর তুলে সেটা হয়ে ওঠে সেমি মার্কেট, যার মেঝে সিমেন্টের, দরজাগুলো ভালো কাঠের। মানুষের পরিবর্তে সেখানে ঠাঁই হয় ডাল-চাল-আলু-পেঁয়াজ-বিস্কুট চানাচুরের। মানুষের চেয়ে পণ্য এখন দামি, পণ্য এখন শক্তিময়। জগতে দামি আর শক্তিময়েরাই টিকে থাকে। নদীর অদামি জলের মতো ভেসে যান তাই সুরেশ, সুরেশরা। ভাসতে ভাসতে থেমে যান রূপনগরে, মন্তাজ মুন্সীর বস্তিতে।

রূপনগরে অনেক বেওয়ারিশ কুকুর বাস করে। সুরেশ বেশ কয়েকদিন তার খুপরি থেকে বের হয়ে বড় রাস্তার পাশে বসে থাকেন আর কুকুরগুলো দেখেন। তার তখন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ওরকম কুকুর হতে ইচ্ছে করে-সংসার নেই, চাল-ডাল কেনার প্রয়োজনীয়তা নেই, ঘুমানোর জন্য মাথার ওপর আবরণের আবশ্যকতা নেই।

রাস্তার পাশে বসে থাকতে থাকতে সুরেশ একদিন তমিজের পাশে বসেন, তমিজের কলা বেচা দেখেন। এরপর আস্তে আস্তে জেনে যান, এ কলাগুলো পাওয়া যায় সদরঘাটে। সেখান থেকে কাঁচা এনে একটা ওষুধ ছিটিয়ে পাকানো হয়, এরপর জনগণকে খাওয়ানোর জন্য বাজারে আনা হয় ঝুড়িতে করে।

সাত ঘাটের পানি খাওয়া সুরেশ একদিন সদরঘাটে যান। কয়েকদিন পর তিনি হয়ে ওঠেন পুরো কলা ব্যবসায়ী। লাভ হয় প্রচুর। প্রতিদিন রাতে কলা বেচেন, খুপরি ঘরের কোনায় বসে টাকা গোনেন রাতে। চিকচিক

করে ওঠে তার চোখের ভেতর, বুক লাফাতে থাকে আনন্দে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দের আতিশয্যে ভেসে যান তিনি একদিন, বউকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যান পূরবী হলে। সিনেমা দেখা শেষে একসঙ্গে এক পেল্লট চটপটি খান। এরপর দুটো সোনালি রঙের চুড়ি, এক পাতা টিপ আর একটা গোল আয়নাও কিনে দেন বউকে। আয়নাটা ঘরের বেড়ার সঙ্গে বাঁধতে হবে, তার জন্য এক টুকরো নাইলনের দড়িও কেনেন তিনি। কিন্তু নিজের ঘরের কাছে আসার আগেই সুরেশ জেনে যান সমস্ত বস্তিটা পুড়ে গেছে- পুড়ে গেছে তার ঘর, পুড়ে গেছে ঘরের কোনায় লুকানো তার সম্পদ। পুড়ে গেছে তার স্বপ্ন-স্বপ্নের ডালপালা। পুড়ে গেছে তার অনাগত সন্তানের জন্য শখ করে কেনা ছোট্ট খেলনাটাও। মাথাটা ঘুরে ওঠে তার, ঘুরে ওঠে তার সমস্ত পৃথিবী। পাশ ফিরে না তাকিয়ে হাত বাড়ান বউয়ের দিকে, কিন্তু স্পর্শ পান না তার। ঝট করে ঘুরে দাঁড়ান তিনি। মাটিতে শুয়ে আছে বউ-চেতনাহীন, লেপ্টে পড়া শাড়ির আঁচলটা পতপত করে উড়ছে বাতাসে।
সুরেশ □াল আবার বসে থাকেন রাস্তায়। কুকুর দেখেন, মানুষ দেখেন, মানুষের শখ দেখেন- হরেকরকমভাবে বেঁচে থাকার শখ।
বসে থাকতে থাকতে আর ভালো লাগে না তার। তবুও বসে থাকেন। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন- তিনি আর হাঁটবেন না। জীবনে অনেক হেঁটেছেন। পেটের জন্য হেঁটেছেন, জীবিকার জন্য হেঁটেছেন, জীবনের জন্য হেঁটেছেন। কই, কোনো কিছু তো হলো না। সুতরাং আর কোনো হাঁটা নয়। কেবল বসে থাকা, বসে বসে অন্যকে দেখা, অন্যের বেঁচে থাকার সাধ দেখা। এভাবেই একদিন টুক করে শেষ হয়ে যাবে সবকিছু। যাক। কিন্তু বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে হঠাৎ হঠাৎ। কেউ একজন আসছে, তাদের অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালাতে আসছে। বড় মায়া হয়, বড় পরান পোড়ে, বড় আয়েশি হয়ে ওঠে মন।
কে যেন একদিন বুদ্ধি দেয় সুরেশকে-বসেই যেহেতু থাকতে ইচ্ছে করে, তাহলে ওজন মাপার একটা মেশিন নিয়ে বসলেই তো হয়। বসে থাকাও যাবে, অন্যের ওজন মেপে দু-এক পয়সা কামাইও করা যাবে। কথাটা মনে ধরে তার। পোয়াতি বউটা অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালায়, আর তিনি কিনা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন!
ধার-দেনা করে অবশেষে একটা ওজন মাপার মেশিন কিনে ফেলেন সুরেশ, সুরেশ □াল; যিনি একদিন মানুষ পোড়াতেন, এখন ওজন মাপেন। রূপনগরের মূল রাস্তা, চিড়িয়াখানার পশ্চিম কোনা, বেনারসি পল্লীর মোড় পেরিয়ে এখন ইনডোর স্টেডিয়ামের ফুটপাতে। সেই ভোররাত থেকে সন্ধ্যারাত পর্যন্তস্ন। ভালোই চলে যাচ্ছিল- স্ত্রীর অন্যের বাসায় কাজ করা আর তার ওজন মাপার যন্ত্র নিয়ে বসা, ভালোই চলে যাচ্ছে জীবন, জীবনের সূত্র।
একদিন সকালে সুরেশ দেখেন তার নিজের বসার জায়গার পাশে আরও একজন এসে বসেছে। লোকটার ছোট্ট কাচের যন্ত্রটার পাশে লেখা-এখানে ডিজিটাল মেশিনে ওজন মাপা হয়। সেদিন রোজগার অর্ধেকের চেয়েও কমে যায় তার। মন খারাপ করে বাসায় ফেরেন তিনি। কিন্তু স্ত্রীর মুখটা দেখেই চোখ দুটো নেচে ওঠে তার, হেসে ওঠে বুকের ভেতরটা। কী সুন্দর লাগছে অপলাকে, দেবীর মতো, আর কপালের সিঁদুরটা কী সুন্দর মানিয়েছে তাকে। বাচ্চা পেটে এলে কী মেয়েরা এরকম সুন্দর হয়ে ওঠে! সুরেশ জানেন না। এগিয়ে গিয়ে পরম মমতায় স্ত্রীর একটা হাত তুলে নেন নিজের হাতে, আরেকটা হাত রাখেন ফুলে ওঠা পেটে, একটু কাছে টেনে জড়িয়েও ধরেন কিছুক্ষণ। অপলা টের পান, গরম এক টুকরো জল পড়ল তার পিঠে; তিনি বুঝে যান, তার স্বামী কাঁদছেন, সুখ-দুঃখের মিশ্রণে কাঁদছেন।
মাঝেমধ্যে মেশিন নিয়ে বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না সুরেশের। বসে থাকতে ইচ্ছে করে সারাক্ষণ, স্ত্রীর পাশে, তার আঁচল ঘেঁষে। তবুও তাকে যেতে হয়-জীবনের তাগিদে, বেঁচে থাকার তাড়নায়।
বেশ কিছুক্ষণ ধরে বসে আছেন সুরেশ। এখনও বউনি হয়নি তার। ডিজিটাল মেশিনওয়ালা অবশ্য তিনজনের

ওজন মেপেছেন। তার মধ্যে দুজন তার পরিচিত, যারা আগে তার মেশিনে ওজন মাপত। বিষণ্নতায় ছেয়ে যায় মন, কষ্টও হয় বেশ। দুপুরের আগে বেশ ঘুম এসে যায় তার। বসে বসে একটু ঘুমিয়েও নেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। ওপাশ থেকে একটা মিছিল আসছে, ইচ্ছেমতো তারা গাড়িও ভাঙছে, সামনে যেটা পাচ্ছে সেটাই ভাঙছে। কোনো জলাশয় ভরাট করা আবাসনের একটা ট্রাক আসে ওপাশ থেকে, তার ওপর বোঝাই মাটি। মিছিলের হাত থেকে বাঁচতে সেটা হঠাৎ ঘুরিয়ে দেয়, ফুটপাতে উঠে পড়ে ট্রাকটি। সামনে তাকানো ট্রাক ড্রাইভার, পাশে বসা সুরেশ আর তার ওজন মাপার যন্ত্র মাড়িয়ে থেমে যায় সামনের একটা দেয়ালে। মানুষ প্রতিনিয়ত যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে, যন্ত্রেরও হয়তো কোনো কোনোদিন মানুষ হতে ইচ্ছে করে, তারও হয়তো ওজন মাপার সাধ জাগে! স্থির হয়ে আছেন সুরেশ, স্থির হয়ে আছে তার মেশিনটাও। উভয়েরই আর কোনোদিন সেই স্থিরতা কাটবে না, আর কোনোদিন মানুষের ওজন মাপার জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে না।

গল্প শেষের আগে
* ব্রিটিশ রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রিন্স উইলিয়াম ও কেট মিডলটনের বিয়ে হলো ধুমধামের সঙ্গে। সমস্ত গণমাধ্যম উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সেই খবর প্রচার করেছে।
* নিজেদের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করা ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সারা পৃথিবীর সব সংবাদপত্রের সম্পাদক মহোদয়রা সেটা লাল অক্ষরে ১৬০, ১৮০, কেউ কেউ ২২০, ২৪০ পয়েন্টে প্রথম পাতায় ছেপেছেন।
* সিতেশ রঞ্জন দেবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে বন্যপ্রাণী সেবাশ্রমের এক অজগর দম্পতি ডিম দিয়েছে। সেই ডিমে তা দেওয়া কু লী পাকানো সাপের ছবিও ছাপা হয়েছে খুব গুরুত্ব দিয়ে, বক্স করে।

অনেক খবরই ছাপা হয় পত্রিকায়-প্রাণীর, গাছের, মানুষের। কিন্তু মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে আসা সুরেশ তার মানুষ পরিচয়ের মর্যাদা পান না কারও কাছ থেকেই-না স্রষ্টার কাছ থেকে, না মানুষের কাছ থেকে। হয়তো তাই কোনো ভিজুয়াল গণমাধ্যমে কয়েক সেকেন্ড ফুটেজ ভিজুলাইজড হবে না তার মৃতদেহের; প্রথম পাতা, শেষ পাতা দূরে থাক, মাঝের পাতার কোনো সিঙ্গেল কলামেও প্রকাশিত হবে না তার মৃত্যুসংবাদ। আর জাত-অজাত, ধর্মীয় প্রভেদের বেড়াজালে পড়ে থাকবে অবহেলায়, সৎকার করতে আসবে না মানুষের সেবক দাবি করা কোনো প্রতিষ্ঠান; কোনো মানুষও ছুঁয়ে দেখবে না আইনের ফাঁদে পড়ার ভয়ে! চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া ওজন মাপার মেশিনের ওপর চ্যাপ্টা হয়ে থাকেন সুরেশ অনেকক্ষণ-রক্তগুলো শুকিয়ে কালচে হওয়া পর্যন্ত, শরীর থেকে পচনের গন্ধ বের না হওয়া পর্যন্ত।

গল্পের শেষটুকু
খুব যত্ন করে তরকারি রাঁধছেন অপলা, অপলা □□াল। ডালের বড়ি ভেজানো বেগুনের সালুন তার স্বামীর দারুণ পছন্দ। অনেকদিন ধরে খেতে চেয়েছেন। এই সালুনটা তিনি বেশ ভালো রাঁধতে জানেন।
পেটটা বেশ বড় হয়ে গেছে, হঠাৎ হঠাৎ পা দিয়ে গুঁতোও দেয় ভেতরের দুষ্টুটা। কষ্ট হচ্ছে তার। তবুও তিনি সালুন রাঁধতে থাকেন আর অপেক্ষা করতে থাকেন-এই তো তার স্বামী এলো বলে, এই তো অস্থির গলায় বলল বলে, 'কই গো, এক গল্লাস ঠা□ পানি দ্যাও তো! বুকের ভেতরডা জ্বলতাছে।'